একাত্তরের গণহত্যা ও ‘জীবনঢুলী’

মাসুম আওয়াল

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আমাদের শেকড়ের ইতিহাস। তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি লাল সবুজ পতাকা। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে আমাদের সহযোগিতা করে মুক্তিযুদ্ধের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র এক একটি ঐতিহাসিক দলিল। ১৯৭১ সালের পরে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইতিহাস ঘিরে তৈরি হয়েছে অনেক চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র। তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার প্রয়াসে রঙবেরঙ নিয়মিত আয়োজন করে আসছে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নিয়ে। এ পর্বে আলোচনা থাকছে ‘জীবনঢুলী’।

মুক্তির আলোয়

জীবনঢুলী বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত একটি আলোচিত চলচ্চিত্র। ১৯৭১ সালে এদেশের সাধারণ মানুষদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভীষিকাময় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তারই এক চলমান দলিল এই চলচ্চিত্র। নির্মিত হয়েছে সরকারি অনুদানে। ২০১৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি চলচ্চিত্রটি মুক্তির আলোয় আসে।

অভিনয় ও চিত্রগ্রহণ

তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত এই সিনেমায় নিম্নবর্ণের দরিদ্র ঢাকি জীবনকৃষ্ণ দাসের জীবন এবং তার এলাকায় ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রগ্রহণ করেছেন মাহফুজুর রহমান খান, শিল্পনির্দেশনা ও প্রধান সহকারী পরিচালক উত্তম গুহ, সংগীত পরিচালনা সৈয়দ সাবাব আলী আরজু, সম্পাদনা মহাদেব শীপ। এই চলচ্চিত্রে জীবনকৃষ্ণ দাস চরিত্রে শতাব্দী ওয়াদুদ ও সন্ধ্যা রানী চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যোতিকা জ্যোতি। আরও অভিনয় করেছেন রামেন্দু মজুমদার, তবিবুল ইসলাম বাবু, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, চিত্রলেখা গুহ, প্রাণ রায়, ইকবাল হোসেন, পরেশ আচার্য, উত্তম গুহ, জামিলুর রহমান শাখা, রিমু খন্দকার ও রিয়াজ মাহমুদ। ৯০ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছে ‘কিনো আই ফিল্মস’। চলচ্চিত্রটির সার্বিক অভিনয় সুন্দর ও সাবলীল। শতাব্দী ওয়াদুদ এ প্রজন্মের একজন শক্তিশালী অভিনেতা। জীবন চরিত্রটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জিং চরিত্র। পুরো সিনেমায় তাকে কাঁদতে দেখা যায় না। সিনেমাটিতে পার্শ্ব চরিত্রে দারুণ অভিনয় করেছেন গুণী শিল্পী ওয়াহিদা মল্লিক জলি।

কী আছে চলচ্চিত্রে

১৯৭১ সাল। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার অন্তর্গত পরাণপুর গ্রামের গরীব ঢাকি জীবনকৃষ্ণ দাস ‘জীবনঢুলী’ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আগে গরীব ঢাকি জীবনঢুলীর জীবন কাটছিল সুখে-দুঃখে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাণপুর গ্রাম আক্রমণ করলে শরণার্থী হিসেবে ভারতে পলায়নের সময় জীবনঢুলীর স্ত্রী ও সন্তান চুকনগর গণহত্যায় নিহত হন। জীবনঢুলী সীমান্ত পার না হয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। পরাণপুর গ্রামে তখন মালেক শিকদারের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ। রাজাকাররা জীবনঢুলীকে বাঁচিয়ে রাখে এই শর্তে যে ওকে রাজাকার বাহিনীর বাজনদার হিসেবে বাজাতে হবে। নানা অপমান ও লাঞ্ছনা সয়ে রাজাকারদের বাদক হয়ে কাটতে থাকে জীবনঢুলীর দিন।

নির্মাণের পেছনের গল্প

তানভীর মোকাম্মেল ২০০১ সালের দিকে যুক্তরাজ্যের একটি গ্রন্থাগারে বিশ্বের আলোচিত ১০০ গণহত্যা শীর্ষক একটি বই খুঁজে পান। আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়তে বসলেও একরাশ হতাশা নিয়ে

বইটি শেষ করতে হয় তাকে। কারণ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত চুকনগর গণহত্যা সম্পর্কে সেই বইয়ের কোথাও উল্লেখ ছিল না। অথচ চুকনগরে যত মানুষকে একসঙ্গে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তারচেয়ে অনেক কম মানুষ নিহত হয়েছে এমন গণহত্যার ইতিহাস স্থান পেয়েছে বইটিতে। তানভীর মোকাম্মেল সেখানেই বসে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এই গণহত্যার উপর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। দেশে ফিরে তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যচিত্র '১৯৭১' নির্মাণের কাজ শুরু করেন। সেই উদ্দেশ্যে দেশের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে তিনি তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তথ্যচিত্রটি বানানোর পাশাপাশি তার মাথায় ঘুরছিল চুকনগর গণহত্যা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা। ২৫০ ঘণ্টার ডিজিটাল ফুটেজ ধারন করার মধ্য দিয়ে শেষ হয় তথ্যচিত্রটি। এরই মাঝে তিনি দেখা পান জীবনকৃষ্ণ দাসের। খোঁজ মেলে অজানা গল্পের। তানভীর মোকাম্মেল বুঝে ফেলেন তিনি তার চলচ্চিত্রের গল্প পেয়ে গেছেন। লিখে ফেলেন চিত্রনাট্য। ২০০৯ সালে হুবার্ট বালস ফান্ডে সেরা চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেয়ে যান। এরপর ২০১০-১১ অর্থবছরে পান সরকারি অনুদান। ২০১২ সালের ২ অক্টোবর মহরত হয়ে ১০ অক্টোবর থেকেই শুটিং শুরু হয় চুকনগর হত্যার প্রেক্ষাপটে নির্মিত 'জীবনঢুলী'। চলচ্চিত্রটির শুটিং হয়েছে পূবাইল, সাভারের নয়ারহাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, খুলনার বৈঠাঘাটা, ডুমুরিয়ার চুকনগর, বাগেরহাটের চিতলমারি অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায়।

চুকনগর গণহত্যা

চুকনগর গণহত্যা বিষয়ে একটু আলোকপাত করা দরকার। পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম যেসব গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, এর মধ্যে একটি চুকনগর গণহত্যা। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি হানাদাররা বাগেরহাট দখল করে নেওয়ার পর থেকে গ্রামে গ্রামে চলে তাদের দোসর রাজাকার আর আলবদর বাহিনীর অসহনীয় অত্যাচার। নির্বিচারে মানুষ হত্যার পাশাপাশি তারা নারী নির্যাতন ও লুটপাট চালাতে তাকে। গ্রামের মানুষ প্রাণ ভয়ে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ায়। খুলনার ডুমুরিয়ার ছোট্ট শহর চুকনগর ভারতীয় সীমান্তের কাছে অবস্থিত হওয়ায় যুদ্ধ শুরু হলে খুলনা ও বাগেরহাট থেকে প্রচুর মানুষ ভদ্রা নদী পার হয়ে চুকনগরে পালিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ২০ মে সকাল দশটার দিকে তিনটি ট্রাকে করে পাকিস্তানি সেনারা চুকনগর বাজারের ঝাউতলায় (তৎকালীন পাতখোলা) এসে থামে। তাদের সঙ্গে ছিল হালকা মেশিন গান ও সেমি-অটোমেটিক রাইফেল। দুপুর তিনটা পর্যন্ত তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকে। হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচার আশায় অনেকে নদীতে লাফিয়ে পড়লে বহু মানুষের সলিল সমাধি ঘটে। লাশের গন্ধে ভারী হয়ে যায় চুকনগর ও এর আশপাশের বাতাস। মাঠে, ক্ষেতে, খালে-বিলে পড়ে থাকে লাশ আর লাশ। এসব স্থান থেকে লাশ নিয়ে নদীতে

তানভীর মোকাম্মেল চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ মেনে তিনি সব সময়ই নিখুঁত কাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেন।

২০১২ সালের ২ অক্টোবর মহরত হয়ে ১০ অক্টোবর থেকেই শুটিং শুরু হয় চুকনগর হত্যার প্রেক্ষাপটে নির্মিত 'জীবনঢুলী'।

ফেলার কাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। ঐদিন ঠিক কতজন লোককে পাকিস্তানি বর্বররা হত্যা করে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও যারা বেঁচে গেছেন তাদের হিসাবে এ সংখ্যা ৮ হাজারের বেশি। এ দিন যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ছিল পুরুষ, নারী ও শিশু। চুকনগরের ফসলি জমিতে আজও পাওয়া যায় নিহতদের হাড়গোড়। ধারণা করা হয় ঐ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালায়। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের এক নিশ্চুপ সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছে চুকনগর।

জীবনকৃষ্ণ দাসের চোখে

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার অন্তর্গত পরাণপুর গ্রামের দরিদ্র ঢাকি জীবনকৃষ্ণ দাসের চোখে দেখা চুকনগর গণহত্যাই তানভীর মোকাম্মেলের 'জীবনঢুলী'। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাণপুর গ্রাম আক্রমণ করলে শরণার্থী হিসেবে ভারতে পালিয়ে যাবার সময় জীবনের কাকা, স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান নিহত হয়। প্রিয় মানুষগুলোর মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া জীবন সীমান্ত পার না হয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। ততদিনে মালেক শিকদারের নেতৃত্বে গ্রামে গড়ে উঠেছে রাজাকার বাহিনী। তারা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে এই শর্তে যে রাজাকার বাহিনীর সদস্য হিসেবে তাকে বাদ্য বাজনা করতে হবে। কিন্তু ঢোলের পরিবর্তে তাকে বাজাতে হবে ড্রামস। প্রাণের ভয়ে শত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে নিজের একমাত্র সম্বল প্রিয় ঢোলটাকে ফেলে দিয়ে রাজাকারদের আধুনিক ড্রামসবাদক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে জীবন। প্রকৃতপক্ষে প্রিয় ঢোলটাকে নিয়ে সুর সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠতে না পেরে এক রকম জীবন্মৃত হয়ে কাটতে থাকে জীবনঢুলীর দিন। রাতের বেলায় ঢোলের উপর জমে থাকা ধূলা পরিষ্কার করে নস্টালজিক হয় সে। জীবনের ঘরের ছাদের ফুটা দিয়ে ঢোলের উপর বৃষ্টির ফোটা পড়ে সৃষ্টি হয় সুরের ব্যঞ্জনা। আর জীবনঢুলীর বুকটা ব্যথায় হু হু করে উঠে। জীবনঢুলী চলচ্চিত্রে পরিচালক একবারও চুকনগর নামটি ব্যবহার না করেও গণহত্যার একাংশ তুলে ধরেছেন। যা দেখা যায় জীবনঢুলীর চোখ দিয়ে। চলচ্চিত্রটিতে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগী রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর লুটপাট ও নির্যাতনের চিত্রও তুলে ধরেছেন পরিচালক।

পরিচালকের সফলতা-ব্যার্থতা

তানভীর মোকাম্মেল চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ মেনে তিনি সব সময়ই নিখুঁত কাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেন। 'লালসালু', 'চিত্রা নদীর পাড়ে', 'নদীর নাম মধুমতি'র মতো সিনেমা তিনিই উপহার দিয়েছেন। জীবনঢুলী সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্য, ক্যামেরাওয়ার্ক, শিল্পসজ্জা, মিউজিক, সাউন্ড সবকিছুই বরাবরের মতো নজর কেড়ে নেয় দর্শক ও সমালোচকদের।

শেষকথা

সব মিলিয়ে 'জীবনঢুলী' চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে এক অনন্য সংযোজন। এই সিনেমাটি দেখতে দেখতে দর্শক হারিয়ে যাবেন ইতিহাসের পাতায়। একাত্তরের পাক হানাদারের নির্যাতন, হত্যার দৃশ্যগুলো দেখে গায়ে কাঁটা দেবে। তবে সিনেমার শেষটা আর দশটা মুক্তিযুদ্ধের সিনেমার মতোই। সিনেমার শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ দেখানো হয়েছে। আর এর মধ্যে দিয়েই আসে বিজয়। এখনো না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারেন 'জীবনঢুলী' চলচ্চিত্রটি।